সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়া

বদলে যাচ্ছে

খাসি মায়েদের গল্প

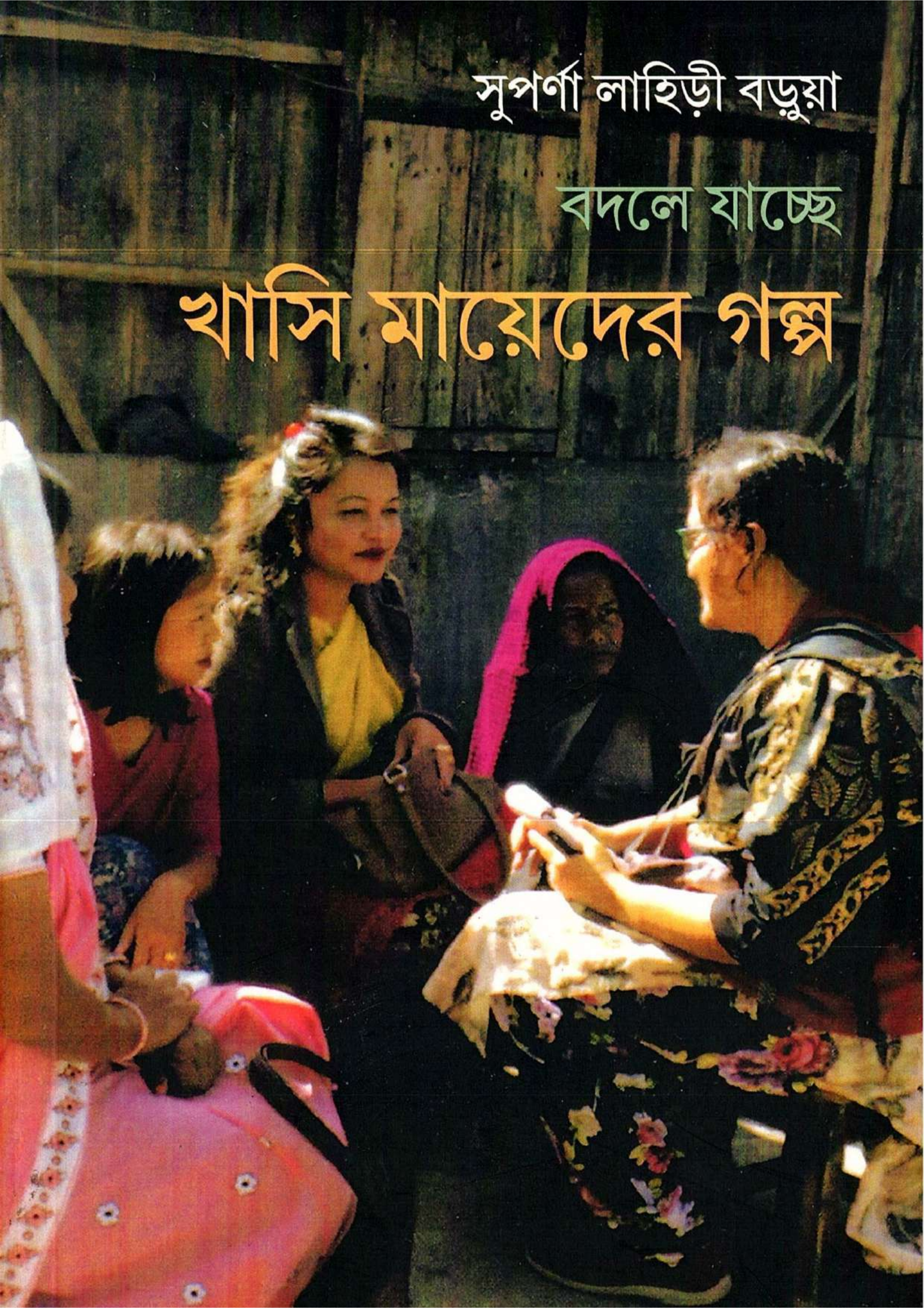

বদলে যাচ্ছে খাসি মায়েদের গল্প

সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়া

বদলে যাচ্ছে

খাসি মায়েদের গল্প

ম ন ফ কি রা
www.monfakira.com
www.boipattor.in

সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়া

বদলে যাচ্ছে
খাসি মায়েদের গল্প

প্রথম প্রকাশ। সেপ্টেম্বর ২০১৯

প্রকাশক। মনফকিরা
২২৮৩ নয়াবাদ, বাড়ি ৮ রাস্তা ১, নবোদিত, মুকুন্দপুর, কলকাতা ৭০০০৯৯
বইপাড়ায় ১৬ কানাই ধর লেন, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন ৯১-৯৪৩৩৪-১২৬৮২/ ৯১-৮৪২০৯-২৯১১১
ওয়েবসাইট www.monfakira.com/ www.boipattor.in
ই-মেল monfakirabooks@gmail.com

বাংলাদেশে একমাত্র পরিবেশক। নোকতা

মুদ্রণ। শরৎ ইম্প্রেশনস প্রা. লি.,
১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

৩০০ টাকা

খাসি মায়েদের হাতে দিলাম

সূচি

মুখবন্ধ ৯
চেরি ব্লসম... চেরি ব্লসম ১৫
এই শহরে বৃষ্টি এলে ২২
ইতিহাসের পাতায় মাতৃপ্রাধান্য ২৬
চিন্তা বেড়েছে খাসি মায়ের ৩১
সরি পাপা ৩৭
গল্প বলছে খাসি মা ৪২
ডাউন মেমরি লেন ৫০
খাসি কারা ৬৩
শিকড়ের খোঁজ ৬৯
খাসি ক্ল্যান ৮০
খাসি পরিবারে 'Ka Khaddu' ৯১
খাসি বিয়ের রকমফের ১০১
খাসি দেশের রাজনৈতিক ক্যানভ্যাস ১১৩
খাসি মেয়েদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ১২৮
তথ্য কিছু বলতে চায় ১৩৮
সাংস্কৃতিক বৃত্তে মাতৃপ্রধান সমাজ ১৪০
নাম দিয়ে যায় চেনা ১৫৯
যাপিত জীবনের প্রাত্যহিকতায় ১৬৬
খাসি মায়েরা ছিন্নমূল হচ্ছে ১৭৮
কিছু তথ্য ভাবায় ১৮৪
কৃষিজীবন থেকে খনিজীবনে খাসি মেয়েরা ১৮৭
ইউরেনিয়ামের লড়াইয়ে খাসি মায়েরা ১৯২
উপসংহারের আগে ১৯৬
একনজরে মেঘালয় ২০৪
গ্রন্থপঞ্জি ২০৯

মুখবন্ধ

ঘরের পাশেই যে 'আরশিনগর' রয়েছে সেটা চিনতে, জানতেই অনেকটা সময় খরচ করতে হয়েছে। এত কাছে! সেই পৃথিবীটা যেখানে বাবা মানে শাসক আর মা মানেই প্রান্তিক নারী, সে রকম নয়? পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় বেড়ে ওঠা জীবনে, এটা নয় সেটা নয়-এর বাধানিষেধের মাঝে কখনও কল্পনাও করিনি মা-কেন্দ্রিক একটা বৈষম্যহীন পরিবার সম্ভব। বাবা অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করবেন আর মা সংসার। এই সংসার মানে বাধ্যতামূলক শ্রমদান এবং যার শ্রমমূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, যুগ-যুগ ধরে চলে আসা এই ছবির বদল ঘটেছে ঠিকই। প্রশ্ন, বিকল্প কী? অণু-পরিবার, একক মা, লিভিং টুগেদার, সমকামিতা ইত্যাদি নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রশ্ন-উত্তরের মূলে কিন্তু বৈষম্য আর প্রতিরোধ। পরিবার, পারিবারিক মূল্যবোধ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তার সঠিক উত্তরাধিকার— এ সব মিলিয়েই পিতৃতন্ত্র। অর্থাৎ বাবা বড়-র সংসার। এর বিপরীতে মাতৃতন্ত্র নয়, মাতৃপ্রাধান্যের সংসার যেখানে মা ঠিক বড় নয়, মা প্রধান। কেমন সেই সমাজটা? কী ধরনের মূল্যবোধ জড়ানো থাকে খাসি পরিবারগুলিতে? এই ধরনের প্রাথমিক ইচ্ছে নিয়েই পা বাড়িয়েছিলাম। প্রথমেই স্বীকার করে নিতে দ্বিধা নেই যে এটা আমার গবেষণাপত্রের মুদ্রিত রূপ নয়। বরং আমার ব্যক্তিগত ডায়েরি বলা যায়। নানা সময়ে, নানা তারিখে, নানা ভাবে একটা অঞ্চলকে আমি দেখতে চেয়েছি কখনও সাংবাদিক, কখনও দর্শক-শ্রোতা হিসেবে, আবার যে-ভাবে একজন মহিলা আরেক মহিলার কাছে যায়, একজন মানুষ যে-ভাবে পরিচিত কাউকে একটু-একটু করে বন্ধু করে তোলে, সে ভাবে।

আসলে একজন গবেষকের তথ্যগত চাহিদাপূরণে বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ সংস্থার সাহায্যের যে-প্রয়োজন এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আর্থনীতিক সহায়তার যে-সম্পর্ক, সেটার ব্যবস্থা করতে পারার মতো যোগ্যতা আমার নেই। আমার মূলধন হল, আমি সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে মিলতে পারি, তার ইতিহাস, সংস্কৃতি আর বর্তমানের অবস্থান থেকে আরেকটা পরিচয় তৈরি করতে চেষ্টা করি। যেহেতু সাংবাদিকতার একটা অতীত পর্ব আছে, প্রতিবেদন তৈরির লক্ষ্যে কিছু জায়গায় যেতে পারি। গত কয়েক বছর ধরে আমি খাসি লোককথা, কবিতা, গল্প, মেঘালয় থেকে প্রকাশিত খবরের কাগজ, পত্রপত্রিকা, খাসি সিনেমা, খাসি

বন্ধু-বান্ধব তৈরি করা, শিলঙে যাওয়া, সেখানকার মিউজিয়ম, চার্চ, সেংখাসিতে যাওয়া আর বাজারগুলি, যেখানে গ্রাম থেকে খাসি মেয়েরা আসে তাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করেছি। আবারও বলি, অত্যন্ত প্রাথমিক অবস্থার সম্পর্ক এগুলি। কারণ মাতৃপ্রাধান্যের পৃথিবীটা জানতে চাই— এই চাহিদাটা খুবই গভীর। বারে-বারে অনুভব করেছি আমার সীমাবদ্ধতা। আমি ১৯৯৭ সালে প্রথমে অসমে আসি। ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে সাংবাদিকতা করতে শিখি। কোলিয়ারি অঞ্চল, ধানবাদ, গিরিডি, রাঁচি, হাজারিবাগ, পালামৌ গিয়েছি, নিয়মিত লিখেছি বহির্বঙ্গের ডায়েরি। সংবাদ প্রতিদিন খবরের কাগজে প্রকাশিত হত সে সব। আমার 'বিহার : নারী-সমাজ-সংগ্রাম' সে সব লেখার সংকলন। প্রকাশ করেছিল ২০০৮ সালে কলকাতার প্রকাশক। ১৯৯৭ সাল থেকে অসমিয়া পরিবার, অসমের গ্রামের সঙ্গে পরিচয় তৈরি হয়। আমার জীবনসঙ্গী উজান অসমের প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে, তাই সেই সুবাদে একটু হলেও গ্রামকে বুঝতে পারা। সেটাও খুব গভীর বোঝা, এ দাবি করব না। কারণ আমি পাকাপাকি গ্রামে থাকি না। আমি দর্শক হিসেবে পারিবারিক সংস্কৃতি, নিয়ম-বিয়ের ধরন এ সব দেখেছি মাত্র। একই ভাবে মণিপুরে গিয়েছি, রাভা অঞ্চলে গিয়েছি, মেঘালয়ে গিয়েছি। আসলে নিবিড় ভাবে মিশতে হলে সুদীর্ঘ সময় থাকতে হবে। যেমন ছিলেন ভেরিয়ার এলুইন 'দ্য অ্যাবরিজিনালস' লিখতে চোদ্দ বছর আদিবাসী সমাজের ভেতরে।

আমরা যখন কলম হাতে তুলে নেই, কিছু লিখব বলে বা নতুন কিছু দেখব বা জানব বলে, আমার মনে হয় প্রথম শর্তটাই হল পিছুটানকে নির্মম ভাবে ছেঁটে ফেলা। সেটা কেমন? ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের যে-প্রাচীর সেটা ভেঙে দিতে না পারলে মানুষের মনের গোপন কক্ষের একেবারে কোর অঞ্চলে ঢোকা অসম্ভব। সেই পর্যায়ে ঢোকার অসুবিধে অনুভব করি, কারণ মানুষের মনের গভীরে ঢোকার অর্থ তার কষ্টগুলি শুনে-বুঝে তাকে নতুন ভাবে পথ দেখানো, অর্থাৎ একজন সংগঠকের ভূমিকা পালন। সেটা করতে না পারলে, মানুষ কেন বিশ্বাস করবে? আমি সাধারণ মানুষকে বলতে পারি না যে তোমার জীবনকাহিনি আমি শুনছি, দেখছি, কারণ এটা লিখে, বিক্রি করে আমি বেঁচে থাকি। আমায় বলতে হবে, আমি তোমাকে বুঝতে চাই। তোমার সমস্যা তোমার একার নয়, আমারও। এ ভাবে মিটিঙে গিয়েছি। সিনেমা হলে ঢুকেছি। ফুটপাথে বসে চা খেয়েছি। বারে-বারে মনে হয়েছে নিজের সঙ্গেই যুদ্ধ শুরু হল। কত বার মনে হয়েছে, ইস! আরেকটু গভীরে যদি ঢুকতে পারতাম। খাসি ভাষাটা যদি ভালো করে শিখতে পারতাম!

প্রথম যখন অপরিচিত একটা সমাজে যাই, বাইরে থেকে দেখি, তখন মনে হয় সহজ-সরল একটা ফ্রেম। কিন্তু দ্বিতীয় বার গেলেই বুঝতে পারি যতটা সহজ ভেবেছিলাম, ঠিক ততটা নয়। আপাতদৃষ্টিতে খাসি বলতেই মনে হয় একই পোশাক,

ভাষা, খাবার, জীবনযাপন ইত্যাদি, কিন্তু একটা গ্রাম আরেকটা গ্রাম থেকে আলাদা। কথা বলার উচ্চারণে, সাংস্কৃতিক উৎসবে, বেঁচে থাকার ক্ল্যান-নিয়মেই বড় পার্থক্য। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। একবার দুই খাসি মেয়ে, ক আর খ; আমি কথা বলছি, প্রশ্ন করছি, ক উত্তর দিচ্ছে, আমি লিখছি। খ একেবারে চুপ। আমি জানতে চাই ও কিছু বলছে না কেন। ও বলে, তুমি জানতে চাওনি। আমি বলি আমার প্রশ্ন দু-জনের জন্যেই। ও বলে, কী করে? ক তো Pnar খাসি আর আমি Bhoi খাসি। চমকে উঠি। বাড়ি ফিরে বই পড়তে-পড়তে অনুভব করি কতটা পার্থক্য।

আরেকটা মজার অভিজ্ঞতা, শিলঙে একটা মিটিঙে গিয়েছিলাম, মিটিং শেষ হলে কয়েকটি মেয়ে গল্প করেছিল। আমি ভাবলাম, কথা বলি। মেয়েগুলি প্রায় একই ধরনের দেখতে, চুলে রং, মুখে রং, আধুনিক পোশাক, হাতে দামি মোবাইল। আমি জিজ্ঞেস করে বসি, তোমরা কে কোন্ খাসি? আসলে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে প্রশ্নটা করি। ক, খ, গ, ঘ কিন্তু এবার প্রায় একসঙ্গে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, বলে 'We all are same people, are you an outsider?' হঠাৎ ভীষণ অপমানিত বোধ করি। বুঝতে পারি, শহরগুলি এক হচ্ছে। এক সংস্কৃতির যে-স্লোগান, 'ম্যাকডোনাল্ডাইজেশন' করে ফেলার যে চেষ্টা, তাতে সবাই বন্ধু, কারণ সবাই একসঙ্গে সুন্দর ক্রেতা। এই ছেলেমেয়েরা চুলে একই কোম্পানির রং লাগায়, একই ভাবে হেসে সেলফি তোলে, একই ভাবে কানে গুঁজে দেয় ইয়ার রিং। তা হলে?

এখানেই বদলে যাচ্ছে খাসি মায়েদের গল্প। মানুষকে এক সূত্রে বাঁধতে চাইছে বাজার। বলছে তুমি কোন্ গ্রাম থেকে এসেছ সেটা বড় কথা নয়, তোমার নিজস্ব কী বৈশিষ্ট্য আছে বাদ দাও, যদি কড়ি ফেলতে পারো, ভালো করে তেল মাখতে দেব। সব সংস্কৃতি মিশিয়ে একটা সংস্কৃতি, বাজার সংস্কৃতি। এটা যত বিস্তৃত হবে, ততই সমাজের উন্নয়ন হবে। এ ভাবে বুঝতে চাইছে নতুন প্রজন্ম। কিন্তু ওই যে স্থানীয় বাজারে ফল নিয়ে বসে খাসি মহিলা, প্রৌঢ়া কিংবা বৃদ্ধা, সে কিন্তু ফল কাটতে-কাটতে গল্প বলে। ওর গ্রামের আনারসের ইতিহাস, এখন মাটি নষ্ট হচ্ছে, আনারস কম হচ্ছে। ছেলে শ্বশুরবাড়ি যেতে চাইছে না, মেয়ে বাজারে আসতে লজ্জা পায়। নানা গল্প। সেই মহিলা কিন্তু নিজের গ্রামের বৈশিষ্ট্য, মাতৃপ্রাধান্যের সমাজ সম্পর্কে গর্বিত। এখানেই খুঁজে পেয়েছি পরিবর্তনের সময়ের চিহ্ন। আমার সীমিত সাধ্যের মধ্যে আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি কোথায়-কোথায় কী ভাবে মাতৃপ্রাধান্যের সমাজটা বদলে যাচ্ছে।

বারে বারে আমার মনে হয়েছে পরিবর্তন হঠাৎ হয় না। আরেকটা কথা, একটা সমাজ, জীবনধারা বেঁচে থাকে সুস্থ ভাবে সেই জীবনের লোককথা, সংস্কৃতিতে। যদি উন্নয়নের নামে, বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে সে সব ধ্বংস করার চেষ্টা হয়, তা হলে প্রতিরোধও আসে। কারণ মানুষ, সে ব্যক্তিই হোক বা সমাজ, পুরনোকে একেবারে

ভুলে যেতে চায় না। এটা অবৈজ্ঞানিক। এক বিন্দু হলেও সে যখন অতীতকে বাঁচিয়ে রাখে, তার মানে সে সব মেনে নেয় না। আবার প্রতিরোধের লড়াই শুরু হয়। কথাটা অন্য ভাবে বলেছিলেন এক খাসি ভদ্রলোক। সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, বলেছিলেন, আজকের সন্তানদের বোঝানো হচ্ছে মা প্রধান নয়, তুমি যদি টাকা উপার্জন করো তুমিও প্রধান হতে পারো, তাই খাসি ছেলেরা বিরোধিতা করছে। কিন্তু দেখো ওরা একদিন বুঝতে পারবে, আজ মদ-ড্রাগের নেশায় বুঁদ হয়ে বলছে, নেশা ভাঙলে বুঝতে পারবে। সেদিন একটু দেরি হয়ে যাবে। প্রাকৃতিক সম্পদ সব লুঠ হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, এখন খাসি সমাজে অস্থির সময়। দুটো মূল্যবোধ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। মাতৃপ্রাধান্যের সমাজকে সরিয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে। খাসি মায়েরা দুর্বল নয়। সাহসী এবং দৃঢ়। যুগযুগান্তের লোককথাকে এত সহজে তারা ভুলে যেতে পারে না। আমার কিন্তু তাই মনে হয়েছে। গল্প বদলাচ্ছে ঠিকই। চিরদিনই গল্প একজায়গায় স্থির হয়ে থাকে না। প্রশ্ন, গতিপথ কোন্ দিকে? সেটাই আমার খোঁজা, সেটাই আমার নানা প্রতিবেদনে এসেছে। আমার সীমাবদ্ধতাকে ধরে নিয়েই আপনারা পড়বেন। শেষ কথা বলবে, প্রান্তিক হতে না চাওয়া মায়েরা, বোনেরা।

কৃতজ্ঞতা : State Museum of Meghalaya, Shillong; Don Bosco Centre for Indigencus Cultures, Shillong; ব্রাশ সমাজ, শিলং; Khasi Book Stall, Mawkhar Main Road, Shillong; চপলা বুক সেন্টার, শিলং; Sannio Siang Shai, সাংবাদিক, শিলং টাইমস, Jowai; Linda Chhakchhuak, স্বাধীন সাংবাদিক, শিলং; Smt Joy Grance Syiem, Programme Manager, North East Network, Meghalaya; রেহেনা, Action Eight সংগঠন; স্বপন শইকিয়া, Action Eight সংগঠন; Wond Shisha, বড়াবাজারে নিজস্ব ব্যবসা; প্রণীতা, মিনারি স্কুলে পড়ান; Phida, অনাথ আশ্রমের শিশুদের পড়ায়; Aiborlando, শিলং থেকে সাত কি.মি. দূরে Jawa village-এ থাকে; ইরা-অসমিয়া মেয়ে, সারাটা জীবন খাসি গ্রামেই কেটেছে; সুরজিৎ দাশগুপ্ত, শিলং।

এ ছাড়া শিলঙে কলেজের ছাত্রী, বড়া বাজার, পুলিশ বাজারে আসা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেছি, প্রয়োজন মতো। গৌতম ভট্টাচার্য। পারিবারিক বৃত্তে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি দাদা ডা. সিদ্ধার্থ লাহিড়ী; ভাই সাগর লাহিড়ী; জীবনসঙ্গী ভাস্কর বড়ুয়া; পুত্র আকাশ বড়ুয়া। হয়তো-বা আরও কেউ কেউ থেকে গেলেন, তাদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই।

যখন নদী তোমায় প্রশ্ন করে

Desmon L. Kharmaw Phlang

যখন নদী আমাকে প্রশ্ন করবে
কেন বিষাক্ত করে চলেছ।
আমার অবশিষ্ট একটুকরো আত্মাকে,
কী উত্তর দেব আমরা?

আমরা বলব কি,
তোমায় আর ভালোবাসি না মা,
তোমার প্রাচীন ঘুমপাড়ানি গানের সুরে
এখন আমরা লজ্জা পাই।
কিংবা
আমরা কি বলব,
তোমার লালিত বহু যুগের বিশ্বাসকে
আমরা হত্যা করেছি।
নাকি
আমরা বলব,
হে কল্লোলিনী মা, ক্ষমা করো আমাদের
তোমার এক বিন্দু জল দিয়ে হলেও
ভিজতে দাও আমাদের,
শুকিয়ে যাওয়া ধমনীগুলিকে বইতে দাও
হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি কিংবা
কঠিন হৃদয়কে একটু সিক্ত করো,
তোমার প্রবহমান জলোচ্ছ্বাসে
আমাদের তৃষার্ত সংগীতকে প্রবাহিত করো।

অনুবাদ লেখিকার। সূত্র : North East Voices, Selected Poems, An Original Collection from Eclectic publications, Eclectic North-East, June 2017 Issue.

১

চেরি ব্লসম... চেরি ব্লসম

চোখটা লেগে এসেছিল। ঘোর কাটল ট্যাক্সি ড্রাইভারের ডাকে।

— ম্যাডাম, লাবান আ গ্যয়া।

— হ্যাঁ! এত তাড়াতাড়ি লাবান পৌঁছে গেলাম।

একটু লজ্জাই পেলাম। সত্যিই তো, গুয়াহাটি থেকে শিলং এখন ছোট্ট পথ। অল্পবয়েসি খাসি মেয়েটি পাশে বসেছিল। গল্প করতে-করতে কখন যে চোখটা লেগে এসেছিল, টেরই পাইনি। মেয়েটি নেমে গেছে। আগে, অবশ্য অনেক আগের কথাই বলছি, মানে পনেরো-যোলো বছর আগে যখন গুয়াহাটি থেকে শিলঙে আসতাম, মনে হত কী দীর্ঘ পথ! আঁচা-বাঁকা পথের দু-ধারে পাইনের জঙ্গল। আমার মনে হত রাস্তা যেন শেষই হয় না! পাহাড়ি সে পথের সবটুকু পেরিয়ে ছোট্ট এই পাহাড়ি শহরটায় পা রাখলেই মনটা খুশিতে একেবারে নেচে উঠত। যেন অন্য এক রঙিন পৃথিবী অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। আমার মনে হত আমি যেন ঢুকে পড়লাম মেঘের কবিতায়। 'শেষের কবিতা'র অমিত যেমন মাঝে-মাঝেই শিলঙে আসত নির্জনতা উপভোগ করার তাগিদে, আমারও তেমন হত। নৈঃশব্দ্যের অসীম চাদর-জড়ানো শিলং পাহাড়ের গা থেকে নেমে আসা ঝর্নার শব্দে আর পাখির ডাকে আমি যেন হঠাৎ করে নিজেকে আবিষ্কার করতাম। অমিতের মতোই বলতে ইচ্ছে করত, 'পালাই পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে সিলেট-শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুশি।'

আমার মনের ক্যানভাসে ভেসে উঠছে একটা বিস্তৃত বর্ণনা। যা লিখেছিলেন সারদামঞ্জরী। ব্রাহ্ম উচ্চশিক্ষিত মহিলা। শিলঙের জন্যে প্রচুর করেছিলেন। তিনি নিজের জীবনের নানা সময়ের নানা অভিজ্ঞতার একটা সংকলন প্রকাশ

করেছিলেন, 'মহাযাত্রার পথে'। সেখানে তিনি বর্ণনা করেছিলেন এভাবে, "তখন খাসিয়া পাহাড়ে আসিবার রাস্তা বড় দুর্গম ছিল। শ্রীহট্ট শহর হইতে জলপথে রওনা হইয়া পার্বত্য নদীর মোহনায় পৌঁছাইতে প্রায় দুই দিন লাগিত। তারপর চূনাপাথর বহনকারী 'বারকী' নামক নৌকায় চড়িয়া পার্বত্য নদীর উপর দিয়া পাহাড়ের পাদদেশে ঠারিয়া নামক স্থানে পৌঁছিয়া খাসিয়া কুলির পিঠে থাপায় (বেতের চেয়ার জাতীয় জিনিস) চড়িয়া গন্তব্যস্থানে দুই বা আড়াই দিনে পৌঁছাইতে হইত। পাহাড়ের পাদদেশে সেলায় সুমিষ্ট কমলালেবু উৎপন্ন হইত। রাস্তা দুর্গম হইলেও পথের দৃশ্য খুব সুন্দর ছিল। এই সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া পথের ক্লেশ ভুলিয়া যাইতে হইত। আমার স্বামী এই দুর্গম পথে পদব্রজে যাতায়াত করিতেন। রাস্তায় প্রকাশ্যে বিস্কুট খাইলে তখন জাতিচ্যুত হইত। আমি বিস্কুট খাইয়াছিলাম বলিয়া আমার বড় ননদ আমার উপর রাগ করিয়া বহু তিরস্কার করিয়াছিলেন।"

এই যে একটা দুর্গম প্রান্ত যেখানে মন-জুড়ানো নৈঃশব্দ্য, ব্যস্ত পৃথিবী থেকে অনেকেই ছুটে আসতেন এখানে। যেমন কবিগুরু লিখছেন, 'গর্মি যখন ছুটল না আর পাখার হাওয়ায় শরবতে/ ঠাণ্ডা হতে দৌড়ে এলুম শিলঙ নামক পর্বতে/ মেঘ বিছানো শৈলমালা গহন-ছায়া অরণ্যে/ ক্লান্তজনে ডাক দিয়ে কয়, কোলে আমার শরণ নে।'

রবীন্দ্র-অন্বেষক উষারঞ্জন ভট্টাচার্য লিখছেন, "শিলঙের সুদৃশ্য 'জিৎভূমি' রক্তকরবীর আঁতুড়ঘর। কবির সৃষ্টির বেদনা ও সুখের অশীতিপর সাক্ষী।" আসলে কবি শিলঙের রিলবঙে এসে উঠেছিলেন। সেই বাড়িটার নাম জিৎভূমি। বাড়িটার মালিক ছিলেন কলকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যিনি অসমের রসরাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার ভায়রা ছিলেন।

ছোট্ট শহর শিলং আমার স্বপ্নের ঠিকানা। ফাঁক পেলেই ছুটে আসা। মেঘালয়ের সৌন্দর্যের রাজধানী এ শহর। বলা হয় 'Scotland of the East'। ছুটে আসি নানা ঋতুতেই। এবার নভেম্বরে। চেরি ব্লজম উৎসব দেখতে। এবার একেবারেই একা। চেরিফুল শিলঙে নতুন নয়। কিন্তু এই উৎসব পালন এই প্রথম। তার কারণটা বোধ হয় অন্য। এ বছর দেশের প্রধানমন্ত্রী গিয়েছেন জাপানের চেরি ব্লজম উৎসবে। নানারকম দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাঝেই খেয়াল হয়েছে এ ফুলের বিজ্ঞাপন প্রয়োজন! আহা! কী যে সুন্দর এই ফুল! চোখ ভরে যায়। মন নেচে ওঠে। পথের দু-ধারে সারি-সারি চেরি গাছ। তাতে হালকা গোলাপি ফুল।

লাবান ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে ব্রাহ্মসমাজ গেস্ট হাউস। ওখানেই উঠব এবার। লাবান অঞ্চলটার একসময় নাম ছিল ব্রাহ্মপল্লি। সে সময় শিলঙে ব্রাহ্মসমাজের বিশাল প্রভাব ছিল। এই অতীতের ব্রাহ্মপল্লিতে দাঁড়িয়ে মনে পড়ছে দুই খাসি মেয়ের নাম, হেরিষা আর হেলিমন। তাঁদের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের ছিল

নিবিড় সম্পর্ক। পড়েছিলাম প্রথমে বারোজন খাসি বালক ও একজন খাসি বালিকার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছিল ব্রাহ্মসমাজ। তাঁদের বঙ্গদেশে পাঠানো হয়েছিল। হেলিমন ডিংয়েডোর জন্ম হয়েছিল ১৯০০ সালে। তাঁকে প্রথমে ঢাকায় পাঠানো হয়েছিল। হেলিমন ঢাকা ইডেন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেছিলেন।

পরে শিলঙে ফিরে এসে জেল রোডে স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শিলঙে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য প্রচারে হেলিমনের স্মরণীয় ভূমিকা ছিল। তিনি 'ক্ষীরের পুতুল' ও শ্যামা' খাসিতে অনুবাদ করেছিলেন। সেং খাসি স্কুলে অভিনয় করিয়েছিলেন 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'সামান্য ক্ষতি'র খাসি নাট্যরূপ। দীর্ঘদিন তিনি শিলঙের রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য সংঘের সভানেত্রী ছিলেন। আমি জানি না হেলিমনের নিজের জীবনে মাতৃপ্রাধান্যের ভূমিকা কী ছিল। ব্রাহ্মসমাজের সান্নিধ্যে আসার পর ওঁর মনে কি এরকম কোন প্রশ্ন এসেছিল যে খাসি মহিলাদের জীবনে মাতৃপ্রাধান্যের বিষয়টি অতটা প্রধান নয়!

আমার এক কাপ চায়ের প্রয়োজন। আমি পুলিশবাজারে ফুটপাথে উঠে আসি। পুলিশ বাজারের কম-চওড়া ফুটপাথের চা-বিক্রেতারা হয় সিলেটি বাঙালি, নয় বিহার বা উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা। খাসি পুরুষ চোখেই পড়েনি। খাসি মহিলারা চা বিক্রি করে কম। ওরা দেশি ফল, তরিতরকারি, সুপারি, বাদাম, বেতের জিনিসপত্র, ফুল নিয়ে বসে।।

শহরের বিভিন্ন স্কুলের ছেলেমেয়েরা চলেছে লেডি হাইড্রি পার্কের দিকে। সেখানে চলেছে নানা অনুষ্ঠান। এই যে লেডি হাইড্রি পার্ক, এটার আবার নামকরণ হয়েছিল অসমের এক প্রাক্তন গভর্নরের স্ত্রীর নামে। যাই হোক, এই পার্কটা এখন চেরি ব্লজম অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু। সাজানো হয়েছে সুন্দর করে। বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, তারপর গল্পপাঠ। দূর থেকে ভেসে আসছে গান। ইংরেজি গান। যদিও সুরটা কিন্তু খাসি লোকগীতির মনে হচ্ছে। মানুষের ঢল চলেছে পার্কের দিকে। আমি ফুটপাথে অপেক্ষা করছি, বান্ধবী আসবে। নভেম্বর মাস, তবু ঠান্ডা কম। আগে জুলাই মাসে এলেও গরম পোশাকে আসতাম।

আমি আর ইরা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুসরণ করলাম। বাচ্চারা গাইছে, নাচ করছে, চেরি ব্লজম, চেরি ব্লজম। পার্কটা ফুলে-ফুলে গোলাপি হয়ে আছে। তার ওপরে আবার নানা রঙের বেলুন। উফ্, দেখে-দেখে যেন চোখ ফেরাতেই মন যায় না। আরেকটু। আরেকটু। ছেলেমেয়েরা আঁকছে। ব্যস্ত ওরা। খাসি-জয়ন্তিয়া-গারোই বেশি। বাঙালি-পাঞ্জাবিও দেখছি। কমবয়েসি শিক্ষিকা, গায়ে খাসি পোশাক, কা জেইনজেম (Ka Jainjem) জড়ানো। মুখে আধুনিক ছাপ রয়েছে। পার্কের এই মাথা থেকে ওই মাথা দৌড়াদৌড়ি করছে। বাচ্চাদের ছবিগুলো গাছের গায়ে-গায়ে লাগিয়ে দিচ্ছে। আমি আর ইরা ঘুরে-ঘুরে বাচ্চাদের ছবি দেখতে লাগলাম। এই বাচ্চারা কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ের শিশু। ক্লাস ফাইভের তলায় হবে। ওরা যা আঁকছে,

সেটা যদি একটু মন দিয়ে দেখি তাহলে কিন্তু ওদের প্রতিদিনকার পরিবেশ, বেড়ে ওঠার ধারা, চারপাশকে খানিকটা হলেও বুঝতে পারব। যা দেখছে ওরা, যেভাবে বাঁচছে, ঠিক তাই তুলে ধরতে চাইছে। একজন প্রবীণ চিত্রকর যখন হাতে রং-তুলি নেন, তখন সচেতন ভাবেই অনেক কিছু আঁকেন, তাতে কল্পনার রঙে অনেক কিছুই বদলে ফেলেন, কিন্তু শিশুশিল্পী একেবারে সরাসরি তার অবস্থানকেই তুলে ধরবে। আমার কৌতূহল বাড়তে থাকে। চেরিফুলের গাছগুলো হাওয়ায় দুলছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল শুরুর সময়। সোনালি নরম রোদ আর গাছের পাতার ছায়ায় কেমন জানি মায়াবী হয়ে উঠছে পার্কটা। একটা দিন শেষ হবে। চেরি ব্লজম উৎসব তিন দিনের। তিন দিনে অনেক আয়োজন। সন্ধে নামলে পার্কের পাশ দিয়ে নেমে যাওয়া পথ ধরে মানুষ এগোবে পোলো গ্রাউন্ডের দিকে। সেখানে ঝলমলে স্টেজে সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন। মানুষকে টিকিট কেটে ঢুকতে হবে। বান্ধবীর মেয়ে খাসি ছেলেকে বিয়ে করেছে। তার আবার দুই মেয়ে। জামাই কিন্তু মায়ের সঙ্গেই থাকে। বান্ধবীর মেয়ে তার দুটি মেয়েকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে থাকে। বরের বাড়ি বেড়াতে যায়। খাসি ছেলেরা বিয়ে করে বউয়ের বাড়িতে যায়। অসমিয়া মেয়ে বিয়ে করাতে দুই পক্ষ নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিয়েছে এরকম চলও আছে দেখলাম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অসমিয়া বান্ধবী বেশ দুঃখে থাকে। বলে, মেয়েটা নিজের মতো করে সংসার করতে পারল না। খাসি ছেলেদের সঙ্গে অ-খাসি মেয়েদের বিয়েতে একটু-আধটু এ ধরনের মনখারাপের গল্প থাকে।

বাচ্চাদের ছবিগুলো দেখতে-দেখতে অবাক হচ্ছিলাম। কী এঁকেছে খুদে বন্ধুরা? বেশির ভাগই মোবাইল ফোন, গাড়ি, বাবার সঙ্গে স্কুলে যাওয়া, দূরে মা একা, হাত নাড়ছে। দু-একটি শিশুর আঁকায় দেখলাম বাবার হাতে লাঠি। মা একেবারে ছোট, ঠিক পুতুলের মতো। হঠাৎ আমার মনে হল, আচ্ছা, খাসি সমাজে, পরিবারে কি সংঘাত বাড়ছে? বাবারা মায়েদের মারে? বান্ধবীর কাছে জানতে চাইলাম। বান্ধবী খাসি নয়, কিন্তু খাসি গ্রামেই থাকে। সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, ওদের মধ্যে পারিবারিক সংঘাত লেগেই থাকে। মারপিট। পুরুষ মদ খেয়ে আসছে। মারছে। বাসন ভাঙছে।

— সে কী ? কিন্তু খাসি সমাজ তো মাতৃপ্রাধান্যের সমাজ!

— বাদ দাও মাতৃপ্রধান! এ সব নামেই।

— মহিলাদের ওপর অত্যাচার, অপরাধ বাড়ছে?

— হ্যাঁ।

সামন্ত-চিন্তায় গড়ে ওঠা পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক পরিকাঠামোয় পুরুষের কর্তৃত্ব মেনে নেয় মেয়েরা। এ ধরনের ছবিই যেন স্বাভাবিক ছবি হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে কথাটা অন্য। এখনও পৃথিবীর যে দু-একটি প্রান্ত মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বেঁচে আছে, তার মধ্যে একটি হল মেঘালয়। খাসি-গারো-জয়ন্তিয়া সমাজ। এখানে

মহিলাদের ওপর পারিবারিক অত্যাচার, সামাজিক অত্যাচার, এ সব তথ্য ভাবায়। পুলিশ রিপোর্টও বলছে এখানে মেয়েদের ওপর নানা ধরনের আক্রমণ, অত্যাচার বাড়ছে। তাহলে বলতেই হবে সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে খাসি মায়েদের গল্পও বদলে যাচ্ছে।

এই সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে মাতৃপ্রাধান্যের সমাজকে বুঝতে হলে সমাজের প্রতিফলিত সৃষ্টি— ছবি, সিনেমা, সাহিত্যকে জানতে হবে। শুধু তাই নয়, মেঘালয়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেটা খুঁজতে হবে। সৃজনশীল মানুষেরা কী ভাবছেন? তাঁরা কি অনুভব করছেন মাতৃপ্রাধান্যের বদলে-যাওয়া ছবিটি।

আমি হেঁটে চলেছি পোলো গ্রাউন্ডের দিকে। ক্রমশ সন্ধে ঘনিয়ে আসছে। হুটোপুটির শিশুরাও ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে পড়ছে আগের বার যখন এলাম, কয়েকজন মিলে শিলং পিক-এ গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরে বন্ধুরা বলল, চলো যাই একটা সুন্দর ঝর্না Sweet falls দেখে আসি। এই পুলিশ বাজার থেকে মাত্র নয় কিমি দূরত্বে। পাইনের জঙ্গলে। দূরে শিলং পাহাড়ের গায়ে বিন্দু-বিন্দু আলো। ওখানে। ছোট্ট একটা গ্রাম আছে— Mawshbuit village। ছোট্ট খাসি গ্রাম। সেই গ্রামের কাছে ছোট্ট বাজার, Happy Valley Market। কাছেই অসম রেজিমেন্টাল সেন্টার, গোর্খা ট্রেনিং সেন্টার। গ্রামের খাসি ছেলেটি, রুকটা লিনডো, আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল কাছের ছোট্ট একটা মিউজিয়ম দেখাতে। Ever Living Museum। কী সুন্দর করে খাসি-জয়ন্তিয়া-গারো জনগোষ্ঠীর একটা ছবি ধরে রেখেছে। পুরনো দিনের। পয়সা 'UMawkhan' আর কয়েকটা Religious stone, কত ধরনের ফসিল রাখা ছিল। সুন্দর-সুন্দর নানা রঙের পাথর ছিল। আসলে মেঘালয় পাথরের দেশ। মিউজিয়মের বাগানটা রঙিন হয়েছিল নানা ফুলে। এই ফুলের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে খাসি লোকসংগীত, লোকগাথা। সে সবের মধ্যে থেকেই আবিষ্কার হয় মাতৃপ্রাধান্যের সুন্দর ছবি।

আমরা যখন মিষ্টি ঝর্না দেখে ফিরছিলাম, ঘন পাইনের জঙ্গলে আমাদের গাড়িটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এক নিঃশব্দ শিহরণ। দূর থেকে ভেসে আসছিল ঝর্নার একটানা করুণ শব্দ। কোন জনমানবের সাড়া নেই। শুধু দূরের খাসি পাহাড়ের গায়ে টিমটিমে আলো। জঙ্গল থেকে শব্দ ভেসে আসছিল। একনাগাড়ে ডেকে চলেছে হুম-হুম করে একটা পাখি। বোধ হয় স্যালিঙ্গিয়েম। আমার পাশে বসা খাসি ছেলে লিডো তা-ই বলল। ও আমাকে শোনাল সুন্দর একটা খাসি রূপকথা বা উপকথা। শিলং নামের উৎপত্তির উপকথা।

খাসি টানে ইংরেজি ভাষায় U Shyllong, অর্থাৎ যে প্রকৃতির হাত ধরে বেড়ে ওঠে, তার গল্প শুনছি। শিলং শহরের দক্ষিণ দিকে, প্রায় চোদ্দ-পনেরো কিমি দূরে

মিলিয়ম (Mylliem)-এর দিকে ছোট্ট একটা গ্রাম, নাম তার বিসি। সেখানেই থাকত খাসি মেয়েটি। তার নাম ছিল লির। একদিন লির মা হল, কুমারী মা। মেয়েটি জন্ম দিল আশ্চর্য সুন্দর মৃত দেবশিশু। মা লির কাঁদতে-কাঁদতে নিজের পুত্রসন্তানকে বাড়ির ফুলের বাগানের এক কোণায় মাটি চাপা দিল। তারপর কেটে গেছে অনেক বছর। কুমারী মায়ের বয়স হয়েছে। এক রাতে হঠাৎ লির-এর ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে লোকেদের চাপা গল্পের স্বর। এই গভীর রাতে কেন মানুষরা জড়ো হয়েছে আমার বাগানে? তারা কী বলছে? লির দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। বাইরে অন্ধকার রাত্রি। লির দেখতে পায়, যেখানে বহু বছর আগে তার পুত্রকে মাটি চাপা দিয়েছিল, সেখান থেকে উঠে আসছে একজন সুন্দর, সুঠাম সুপুরুষ। তার দিকেই এগিয়ে আসছে। লির ভয় পায়। ছেলেটি তার কাছে এসে বলে, মা, আমি তোমার সেই ছেলে যাকে তুমি আদর করে তোমার ফুলের বাগানে ঘুম পাড়িয়েছিলে। ভয় পেও না। তুমি আমার পৃথিবী মা (Ka Mei Ramew)। যে-ছেলেটি প্রকৃতির হাত ধরে বেড়ে ওঠে, তার নামই U Shyllong। এই নামের অর্থ হল প্রকৃতির হাত ধরে বেড়ে ওঠা।

গল্পটা গোধূলিলগ্নে এক আশ্চর্য করুণ রূপ সৃষ্টি করল। আমাদের মাথার উপরে হঠাৎ একঝাঁক ছোট পাখি, আবছা অন্ধকারে রংটা বুঝতে পারলাম না। লিডো চেনে ওদের, পাখিদের। বলল, লাল আর হলুদ হয় জ্যালিসিউ। ওদের ডাক মিষ্টি। ওরা বোধ হয় পথ হারিয়েছে।

— কোথায় যেতে চেয়েছিল ওরা?

— শিলং পিক-এর দিকে, উমিয়ম নদীর দু-পারে পাইনের ঘন জঙ্গলে ওয়াটেল গাছের সারি, সেখানেই তো থাকে জ্যালিসিউরা।

— ওয়াটেল গাছ কেমন দেখতে?

— তুমি দেখোনি! ঝিরঝিরে পাতা। নীলচে সবুজ রং। তাতে ছোট-ছোট হলুদ ফুল। সেই ফুলের দারুণ গন্ধ।

— আমায় দেখাবে, লিডো?

— তুমি ডিং ইয়েই পাহাড় দেখেছ? শিলং পিক-এ গেলে, যখন ঢালুতে নেমে আসবে, দেখতে পাবে এজেলিয়া আর রডোড্রেনড্রন ফুলও। আমরা ছোটবেলায় বন্ধুরা ওই ফুল তুলতেই যেতাম। এখন অবশ্য ফুল কমে এসেছে।

— হ্যাঁ, লিডো, সব জায়গায় জঙ্গল শেষ হচ্ছে, পাখিরা দূরে পথ হারাচ্ছে, ফুল কমে যাচ্ছে। তাই না?

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই ছোট রাজ্য মেঘালয়। সংস্কৃত ভাষায় যার অর্থ মেঘের আলয়। অর্থাৎ মেঘেদের ঘর। দেশের উত্তর-পূর্ব দিকের এক ছোট্ট পাহাড়ি অঞ্চল। রাজধানী শিলং। কয়েক বছর ধরেই দেখেছি এই শহরটা বেশ উৎসবমুখর

হয়ে থাকে। শহর থেকে একটু দূরের পৃথিবীতে। আছে কত ঝর্না, পাহাড়, গুহা, মিউজিয়ম, ছোট-ছোট খাসি গ্রাম। কত চার্চ। সারা বছর ধরে এখানে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের ভিড়। এই পুলিশবাজারে ভোরবেলায় দাঁড়ালে দেখা যায় ডাউকি, চেরাপুঞ্জি, সোহারা, জোয়াই... কোথায় কোথায় মানুষ চলেছে প্রকৃতির কোলে আনন্দ উপভোগ করতে। বিভিন্ন ঋতুতে খাসি, গারো, জয়ন্তিয়াদের নানা উৎসব। কত ধরনের নাচ-গান। এত রঙিন সে সব যে দেখলে প্রাণ ভরে ওঠে। কিন্তু এ তো প্রায় ট্যুরিস্ট কোম্পানির বিজ্ঞাপন হয়ে যাচ্ছে, তাই না! এই মুহূর্তে বিরাট বাজারের যে সর্বব্যাপী আগ্রাসন, মেঘালয়ের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গান, নাচ, জনগোষ্ঠীর উৎসবের হাত ধরেই হচ্ছে। বাজার তৈরি হচ্ছে। এই চেরি ব্লজম উৎসব তারই উদাহরণ। জনগোষ্ঠীর ছোট-ছোট মেয়েকে একত্রিত করেছে একটা কাপড়ের কোম্পানি। ডিজাইনার বাইরের। খাসি মহিলাদের পোশাক সম্পর্কে যার কোন ধারণা নেই, কিম্ভুতকিমাকার করে মডেলকে সাজিয়েছে। খাসি গানের যে প্রকৃত সুর তার মধ্যে অন্য সুর মিশিয়ে ইংরেজি, হিন্দি গান তৈরি করছে। একটা খাসি মেয়ে বা ছেলেকে তুলে নিচ্ছে, সে মুম্বাইতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারছে অর্থাৎ তার হাত ধরেই চলে যাচ্ছে স্থানীয় সুর, কথা। আবার সে সব পাঁচমিশেলি হয়ে এই বাজারেই বিক্রি হচ্ছে। খাসি উপকথায় তৈরি লোকগীত যখন মুম্বাইয়ের স্টুডিওয় ঢুকে পাশ্চাত্যের রঙে মিশে অন্য একটা সুর হয়ে ফিরে আসছে, সঙ্গে গ্রামের ভিডিও, পাহাড়িয়া ছেলেমেয়েরা 'আমাদের গান' ভেবে মহা আনন্দে সে সব কিনছে আর গাড়িতে ফুল ভল্যুমে শুনছে। রক অন-২ এখন প্রায় একটা গ্রামের নামই হতে বসেছে। শিলঙের পুলিশবাজারে রাত নামলেই দেখা যায় এদিকে-সেদিকে গাড়ি দাঁড় করানো। ভেতরে কমবয়েসি ছেলেরা বসে মদ খাচ্ছে আর গান শুনছে। শিলঙের দু-একজন। অখাসি মানুষের বক্তব্য হল যে এক শ্রেণির খাসি লোকের হাতে প্রচুর কাঁচা পয়সা, তাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরাই মূলত বিপথে যাচ্ছে। কথাটা পুরো সত্য নয়। কারণ প্রশ্নটা বিপথে যাওয়ার নয়। প্রশ্নটা পরিবর্তনের দিকনির্ণয়ের। এই মুহূর্তে খাসি সমাজে ঠিক কী-কী পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে, আর ঠিক কোন্ দিক থেকে পরিবর্তনগুলো আসছে? যদি দেখি, তাহলে কম-বেশি পরিমাণে সব জনগোষ্ঠীয় সমাজের ছবি অনেকটা মিলছে। আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ছবিতে দেখা যাচ্ছে জনগোষ্ঠীয় সমাজের সাংস্কৃতিক সব উৎসব বৃহৎ বাজারে অনুপ্রবেশের জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। জনগোষ্ঠীয় জীবনচর্যাকে পুঁজিবাদের দর্শনে সাজানো হচ্ছে আর পুঁজির অবাধ গতি অব্যাহত রাখার চেষ্টা চলেছে। বাইরের পুঁজি আনার চেষ্টা এবং সেই পুঁজিকে এক শ্রেণির মানুষের ভোগ-বিলাসে কাজে লাগানো। বাদবাকি সাধারণ মানুষ যারা দিন আনি দিন খাই, তাদের অবস্থা সংকটে। এ সব মিলিয়ে চলেছে পরিবর্তনের হাওয়া। এ

সব নিয়েই খাসি সমাজ বা মাতৃপ্রধান একটা সমাজের গল্প। দিন বদলানোর গল্পে শুধু বদলে যাচ্ছে চলে-আসা নিয়ম, নীতি, সম্পর্ক, অভ্যাসের নানা দিক। এখন মেঘালয় যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থানে যেন খুব সহজ ভাবেই প্রশ্ন উঠছে পিতৃপ্রাধান্যের সামাজিক অবস্থান কেন হবে না? বলা যায়, পুরো সমাজটাই একটা Transitional period-এর মধ্যে দিয়ে চলেছে। যেটা কিন্তু খুব সুস্থির ছবি নয়। একটা সংঘাতপূর্ণ, আক্রমণাত্মক ছবি।

২

এই শহরে বৃষ্টি এলে

মেঘ ডাকছিল গমগম করে। পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালাম। দূরে শিলং পাহাড়ের গায়ে কালো মেঘ জমছে। মাঝে-মাঝেই বিদ্যুতের ঝলকানিতে রঙিন হচ্ছে অন্ধকার। কেমন জানি মনখারাপের প্রহর। রাত অনেক হয়েছে। সঙ্গভাষে সময় দেখলাম, রাত দুটো। বৃষ্টি নামল। এক কাপ সবুজ চা তৈরি করলাম। কবিতার বই সঙ্গে আছে। মল্লিকা সেনগুপ্ত। ওঁর দুটো কবিতা পাশাপাশি রাখলাম। আশ্চর্য! দুটো কবিতার সঙ্গে বর্তমান মুহূর্তটা এত সুন্দর মিলেমিশে গিয়েছে! বইটার নাম, 'বৃষ্টি মিছিল, বারুদ মিছিল'। বাইরে একটানা বৃষ্টির শব্দ। দুটো কবিতাই একসঙ্গে পাঠ করতে লাগলাম।

বৃষ্টি শহর

এই শহরে বৃষ্টি এল/ বৃষ্টিপাগল একটি ছেলের/ জন্মদিনের খুশির মতো এলোমেলো/...

শিলং পাহাড়ে

আমাদের এই কুয়াশা পাহাড়ে/ দেখা হল যেদিন হঠাৎ/ লাবণ্য আর অমিত রায়ের/ তোমার আমার এমনই বরাত,/ চেরাপুঞ্জিতে মেঘ ঘনিয়েছে/ শিলং পাহাড়ে কুয়াশা নিবিড়/ অর্ধেক পথে পুরনো যুগল/ জলে ভিজে যায় ক্ষণিক শিবির...

সেই প্রথম, ১৯৯৮ সালে, চেরাপুঞ্জিতে এসেছিলাম। স্পষ্ট মনে আছে কেমন ভিজে-ভিজে সেই Mawsmai ঝর্নাটা দেখেছিলাম। একটা বড় ছাতা ভাড়া নিলাম পরে। আমাদের মাঝে চেরাপুঞ্জির আকাশ থেকে ঘন মেঘ নেমে এসেছিল। ঝর্নার কাছেই একটা গ্রাম আছে। ঝর্নার নামেই পরিচিত— Mawsmai village। সেখান থেকেই খাসি-জয়ন্তিয়া মেয়েরা ঝর্নার আশেপাশে দোকান দেয়। ছাতা ভাড়া দেয়। ফল, বাদাম, চিপস বিক্রি করে। চেরাপুঞ্জিতে সেই সাতটা ঝর্না একসঙ্গে রয়েছে, তাই বুঝি সবাই বলে Seven Sister Falls। শিলং শহর থেকে পঞ্চাশ কিমিরও বেশি দূরে থাকা এই চেরাপুঞ্জি বিশ্ব দরবারে এই সেদিন পর্যন্ত ছিল সব চাইতে বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চল। কিন্তু তিন-চার বছর আগে যখন এলাম, দেখলাম বৃষ্টি নেই। কেন? জঙ্গল কমে আসছে? পাহাড় আর জঙ্গলই যে মেঘালয়ের পরিচয়। তিনটে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই মেঘালয়। খাসি, জয়ন্তিয়া আর গারো পাহাড়। মেঘালয়ের মানচিত্রটা খুলে বসলে দেখা যায় উত্তর-পূর্ব দিকে অসম, দক্ষিণ-পশ্চিমে সমতলভূমিতে বাংলাদেশ। এই মেঘরা ঘন-ঘন এসে জড়ো হয় বে অব বেঙ্গল থেকে। ছুটে আসে মেঘালয়ের আকাশে। তাই তো এত বৃষ্টি!

মেঘালয় মাতৃপ্রাধান্যের দেশ। এখানে মুখে-মুখে মায়েদের গল্পই বেশি শোনা যায়। একজন খাসি বুড়ি শুনিয়েছিল Nohkalikal Falls-এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটা ছোট্ট করুণ রূপকথা। সুন্দর ঝর্নাটা আসলে নাকি এক মানবী। গ্রামের মানুষ তাই মনে করে। ঝর্নার শব্দে কান পাতলে নাকি শোনা যায় এক মায়ের আর্তনাদ। এক মা ছায়াময় এই উপত্যকায় দেখেছিল তার ছোট্ট মেয়েকে তার দ্বিতীয় স্বামী হত্যা করল, সহ্য করতে না পেরে ঝাঁপ দিয়েছিল নিচে। তারপর সে ঝর্না হয়ে যায়। একনাগাড়ে শুধু কেঁদে চলে। আশ্চর্য! মাতৃপ্রাধান্যের দেশের এই করুণ কাহিনি? বাবার হাতে কন্যার হত্যা! এই মুহূর্তে আমার সঙ্গভাযে দুটি ছোট্ট বার্তা। খুন হয়েছে দুই খাসি কিশোরী। মেঘালয়ে মেয়েদের ওপর অত্যাচার, আক্রমণ, অবিচারের পরিসংখ্যান ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। পুলিশের তথ্যই বলছে। আজও আমাদের দেশে বা বিশ্বে যে দু-একটি প্রান্তর মাতৃপ্রাধান্যের পতাকা হাতে নিয়েছে তার মধ্যে মেঘালয় একটি। খাসি, গারো, জয়ন্তিয়া এই তিনটি জনগোষ্ঠীয় সমাজেই এখনও মাতৃপ্রাধান্যের ধারা বয়ে চলেছে। যদিও একটা পরিবর্তনমুখী পরিবেশও গড়ে উঠছে বা বলা যায় একটা পরিবর্তনের ধারায় ঢুকে পড়েছে। আমি এটাই খুঁজতে চাই। কেন বদলে যাচ্ছে? কোথায়-কোথায় ঠিক বদলগুলো দেখা যাচ্ছে? আধুনিকতার কোন্ সন্ধিক্ষণে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা মাথা চাড়া দেয়? এ সম্পর্কে খাসি মানুষেরা কী ভাবছেন? মহিলাদের ভাবনা আর পুরুষদের ভাবনা কি ভিন্ন?

Matrilineal শব্দটা ল্যাটিন শব্দ। mater, matris, mother থেকে এসেছে। যার অর্থ সম্পর্ক বা kinship-এর অবস্থান এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে হস্তান্তর

হবে মায়ের দিক থেকে। Matrilineal কিন্তু matriarchy নয়। এখানে বলা যাবে না মায়ের কর্তৃত্বের কথা। যেটা patriarchy-তে ভীষণ ভাবে স্পষ্ট। পিতৃতন্ত্র শব্দটার শাব্দিক অর্থই হল পিতা বা পণ্ডিতের শাসন। এই শব্দটা এসেছে ল্যাটিন শব্দ প্যাটার (pater) থেকেই। পিতৃতন্ত্র পুরুষের আধিপত্যবাদকে উৎসাহিত করে, প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় নারীকে। এই আধিপত্যবাদের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় পরিবারের ভেতরে, শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে। নারীবাদী তাত্ত্বিক সিলভিয়া ওয়ালি Theorising Partriarchy বইয়ে ১৯৯০ সালে লিখেছিলেন 'পিতৃতন্ত্র হচ্ছে সামাজিক পরিকাঠামো ও রীতিনীতির এমন এক ব্যবস্থা যেখানে পুরুষ নারীকে নিয়ন্ত্রণ করে, নিপীড়ন ও শোষণ করে। পিতৃতন্ত্র শব্দটা প্রাথমিক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল একটি বড় পরিবারে; যেখানে নারী, পুরুষ সকলেই নতজানু হয়ে কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিচ্ছে পিতার। কিন্তু মাতৃপ্রাধান্য একেবারেই বিপরীত ধারার। এই ব্যবস্থার মূল অর্থ হল এখানে সন্তানের পরিচয়, পদবি মায়ের ধারাতে হয়। বংশ-পরিচয় (Clan Identity) মায়ের। মায়ের সম্পত্তি বাড়ির ছোট মেয়ে সামলায়। পুত্রসন্তান কিছুই পায় না।

খাসি সমাজের মাতৃপ্রাধান্যের গল্প মৌখিক উপকথা। যুগ-যুগ ধরে মায়েরা বলে। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে যেন বয়ে আসে। লাইলুম গ্রামের মেয়ে লারা আমায় শুনিয়েছিল যতটুকু ও শুনেছে ওর মায়ের কাছে। আগে খাসি পুরুষরা সব সময় ব্যস্ত থাকত রাজদরবারে। যুদ্ধে। বাড়ির সব দায়িত্ব ছিল মায়েদের ওপর। স্বাভাবিক ভাবেই বাড়ির পুরুষরা শুধু বাড়ির নয়, গোষ্ঠীর (Clan) সব দায়িত্বই বাড়ির মহিলাদের হাতে দিয়ে দিত। সেভাবেই মহিলারা ঘরের, সন্তানের, গোষ্ঠীর দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়েই কর্তৃত্ব পেয়েছিল এবং সেই কর্তৃত্ব শুধু মৌখিক নয়। যেহেতু সুদূর অতীতে খাসি সমাজ বিশ্বাস করত, 'War and Politics are for men, while property and children are for women.' তাই সেভাবেই একটা ধারাবাহিক নিয়মের প্রচলন হল। মা বাজারে যাবে, উপার্জন করবে, সন্তানের দেখাশোনা করবে, মায়ের পদবি নিয়ে সন্তান বেড়ে উঠবে। পুরুষরা গ্রামের রাজনীতিতে, রাজদরবারে মতামত দেবে। গ্রামপ্রধানের নির্বাচনে অংশ নেবে। উপার্জন করবে, কিন্তু মায়েদের মতো সন্তানদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে না। অনেকটা অন্য মানুষ হয়ে থাকবে। মায়ের দাদা বা ভাই অর্থাৎ মামার ভূমিকা যতটা থাকে ততটা বাবার ভূমিকা থাকে না। যে-কোন গ্রামের খাসি পরিবারে ঢুকলে চোখে পড়ে পরিবারে বুড়ি দিদিমা, তার মেয়েদের (ছোট মেয়েকে Khadduh বলে), তার কর্তৃত্ব চলে। সঙ্গে তার স্বামীও থাকে। এ সব নিয়ে খাসি পরিবার (Iing) তৈরি হয়। বাবা-পিসি-ঠাকুমা সেখানে অনুপস্থিত। ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে তাদের মা-মাসি সবাইকে 'Meisan' বলে। Mei মানে মা, Meisan বড় মাসি, Meiduh ছোট মাসি। যদি একটি

পরিবারে চার বোন থাকে, ছোট বোন ঘরে থাকে, পারিবারিক সম্পত্তি দেখাশোনার ভার তার ওপরেই। অন্য বোনেরা মায়ের বাড়ির কাছাকাছি হয়তো আলাদা থাকতে পারে, কিন্তু ছোটবোন পারে না। সে মায়ের আদি বাড়িতে স্বামী-সন্তান নিয়ে থাকবে। ভাই কিন্তু বিয়ে করে স্ত্রীর বাড়িতে চলে যাবে। এটাই Clan-এর নিয়ম। খাসি-গারো-জয়ন্তিয়া সমাজে এই Clan-এর ভূমিকা বিশাল। Clan গড়ে উঠেছে মাতৃপরিচয় থেকে। খাসি সমাজ মনে করে, খাসি সমাজটাই গড়ে উঠেছে আদি মাতা 'ইয়াওবে টিনরাই' (Ka lawbei Tynrai) থেকে। যে-কোন শুভ বা অশুভ কাজে তাই সেই আদি মাতাকেই স্মরণ করা হয়। বড় সুন্দর লাগে শুনতে। প্রতিনিয়ত এত অবহেলিত মায়েদের দেখেছি, তাদের কথা শুনেছি, পুত্র বহন করে পিতার পদবি, মা কীভাবে জানি অন্যজন হয়ে যায়। প্রথম জীবনে স্বামীর অবহেলা, অত্যাচার, পরে ছেলের। কত মায়েরা আদালতের দ্বারস্থ হন, বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে, যাবে কোথায়? পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধে বেড়ে ওঠা সন্তানের কাছে মায়েরা দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ হয়ে যায়। খাসি সমাজকে প্রথমে দেখলে ভীষণ ভালো লাগে। মনে হয় আমরা সবাই রানি।

মাতৃপ্রাধান্যের ইতিহাসের পাতা খুলে বসলে অনেকটা দূরে যেতে হবে। এক অন্বেষণ। খাসি-গারো-জয়ন্তিয়াদের নিজস্ব অক্ষরবিন্যাস নেই। রোমান অক্ষরে লেখে। কিন্তু মাতৃপ্রাধান্যের এই সমাজে অংসখ্য সুন্দর উপকথা আছে। রূপকথাই বলি। মানুষের মুখে-মুখে চলে আসা সে সব গল্প। ছড়া-কবিতায় মাতৃপ্রাধান্যের ছবি। শস্যের দেবী, বিভিন্ন ঈশ্বরীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, সে সব জড়ো করে পড়লে স্পষ্ট দেখা যায় মাতৃপ্রাধান্যের একটা সুস্থির ছবি। যেমন :

O Paddy o Paddy/ Mother of Millet, mother of paddy/ To dig the soil and sow the grain, to plant the seedling/ I have befriended/ I have sought Co-operation from my companion/ I have proposed a particular day/ I have fixed the date/ with the mother of paddy... (*Inviting the Mother of Paddy*, Private collection of Caroline R. Marak)

এই ব্রতকথাটি সম্পর্কে শুনেছিলাম যে গ্রামে কৃষিকাজ শুরু হওয়ার আগে থেকেই গ্রামের মানুষের মুখে-মুখে সুরে-বেসুরে এই কথাগুলো উচ্চারিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না গ্রামটা সবুজ হয়ে ওঠে, মানুষ যেন প্রাণ দিয়ে শস্যের দেবী, কৃষি-মাতা আর আদি মাতাকে স্মরণ করে। কী সুন্দর, তাই না?

৩

ইতিহাসের পাতায় মাতৃপ্রাধান্য

পুরাতত্ত্ববিদেরা মাতৃপ্রাধান্যের সমাজ ঠিক কেমন ছিল, সেরকম একটা অন্বেষণ অনেক আগেই শুরু করেছিলেন। আমাদের দেশে সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্যের নাম বেদ। সুদীর্ঘ কাল ধরে ভারতীয় পণ্ডিতদের ধারণা ছিল যে বেদ-রচয়িতারাই একাংশ অসভ্য ভারতবাসীকে সভ্য করে তুলেছিল, কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার চিহ্নগুলো তা ভুল প্রমাণ করে। প্রমাণ হয়ে যায় যে বেদ রচনার কয়েক হাজার বছর আগেই এদেশের মানুষ এক আশ্চর্য উন্নত, সুন্দর নগর-সভ্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল, যে-সভ্যতার নাম হরপ্পা ও মহেঞ্জদারো। বৈদিক মানুষদের মূল পেশা ছিল পশুপালন। তখনকার মানুষদের মনে দেব নাকি দেবী, কারা বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল? ইতিহাসবিদেরা বলছেন যে বেদে কোথাও কোন দেবীর সেভাবে উল্লেখ নেই। যে দু-একজনের নাম পাওয়া যায়, তাদের অস্তিত্ব বিশেষ করে পুরুষদেবতাদের পাশে একেবারে নেই-এর সমান। শুধুমাত্র ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে দেবী সুক্তের কথা। যেখানে দেবীদের গৌরবগাথার বর্ণনা আছে বইকি, তবে অনুমান করা হয় যে সেই বিশেষ অংশটি অনেক পরে রচনা করা হয়েছিল। বৈদিক যুগের দেবগণ হলেন ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, পূষণ, অগ্নি, সূর্য। শুধু তাই নয়, ঋগ্বেদের পুরুষসুক্তের একজায়গায় নাকি উল্লেখ আছে এক আদি পুরুষ থেকেই সব সৃষ্টি। খাসি সমাজে এই আদির উৎস ভিন্ন, তারা মনে করে সব কিছুরই সৃষ্টি আদি মাতা থেকে। সব কিছু অর্থে বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষ-জীবন।

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলছেন হরপ্পা-মহেঞ্জদারোর সম্পদ, চাষের ফসল, সেই সভ্যতার মাটির নিচে চাপা পড়েছিল মাতৃপ্রধান সমাজের চিহ্ন। যার প্রমাণ মাটির তলায় খুঁজে পাওয়া বসুমাতার মূর্তি। সেখান থেকেই পাওয়া যায় মাতৃপ্রাধান্যের ছবি। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত হওয়া পোড়ামাটির মূর্তির মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেছে সংখ্যাধিক নারীমূর্তি। বিজ্ঞজনেদের ধারণা হল, সেগুলো হতে পারে খেলার পুতুল, আবার দেবীমূর্তিও হতে পারে। বসুমাতা দেবী। সেখান থেকেই খোঁজা শুরু। সেই সব মূর্তি অনেক কথা বলেছে, মাতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থার ইঙ্গিত দিচ্ছে। ধারণা করা হয় যে মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকা একটা বিশাল সভ্যতা

ছিল, যেখানে মায়েদের অবস্থান ছিল অনেক ওপরে। মহাভারতে আরট্ট দেশবাসীর মধ্যে বাহিক নামক এক জাতির মানুষ বাস করত, তাদের পুত্রেরা কেউই সম্পত্তি পেত না। তার পরিবর্তে সম্পত্তি পেত ভাগ্নেরা। অর্থাৎ একটা পরিবর্তনের ধারা, যেখানে সমাজটা মাতৃপ্রাধান্য থেকে পিতৃতান্ত্রিক ধারার দিকে এগিয়েছে।

যতদিন পর্যন্ত আদিম মানুষ শিকার করতে শেখেনি, ততদিন পর্যন্ত যে-কোন দলের প্রধান কিন্তু মেয়েরাই ছিল। দল বেঁধে ফল, মাছ, ছোট-ছোট জানোয়ার জোগাড় করার পরিক্রমায় দলের মধ্যে পুরুষ আর নারীর কোন ভেদ ছিল না। শুধু একটা দায়িত্ব ছিল, সেটা হল সন্তানকে আগলে রাখা। অর্থাৎ মাতৃত্বের ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব। ইতিহাস বলছে, মাটির ঘট তৈরি বা ঘর তৈরি, কাপড় বোনা, এই শিল্পকাজগুলো মেয়েরাই আবিষ্কার করেছে। কাপড় বোনার তাঁত আবিষ্কার; গাছের ছাল, আঁশ, ফল থেকে সুতো তৈরির প্রক্রিয়া আবিষ্কার; কাপড়ে রং করার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রকৃতি থেকেই বিশাল রঙের সম্ভারকে খুঁজে নেওয়া— এ সব মেয়েরাই করেছে। পাশাপাশি পুরুষ করেছে বল্লম আবিষ্কার। শিকার করার অস্ত্র। জন্তুর সঙ্গে লড়তে শেখা। এই সব অস্ত্র আবিষ্কারের পরেই বোধ হয় দলগুলো ভাগ হল। পুরুষরা দূরে চলে যেত শিকার করতে-করতে। মেয়েরা সন্তান কোলে নিয়ে বড় পশু শিকার করবে কী করে? তারা শিশুকে নিয়ে প্রকৃতি নিরীক্ষণ করত।

কৃষিকাজ আবিষ্কারের মূলে মেয়েরাই। কৃষিকাজ শেখার পর দলে কিন্তু মেয়েরা ক্রমশ প্রধান হয়ে ওঠে। কিন্তু আবার সেই বেশি উৎপাদন করার সময় অর্থাৎ হাত দিয়ে নয়, বলদ জুতে দিয়ে যখন করতে হবে, তখন কিন্তু পুরুষের দায়িত্বেই এসে পড়ত কৃষিকাজ। অর্থাৎ জীবনটা যখন কুটিরশিল্প পর্যন্ত ছিল, ততক্ষণ সমাজে মেয়েরাই প্রধান ছিল। জীবনবৃত্তের পরিধি বাড়তে থাকে, সম্পত্তি বাইরে থেকে এনে ঘরে জমা করা হয়। কিন্তু তা আগলে রাখার প্রশ্ন যখন এল, তখন সে দায়িত্ব মায়েরাই পেল। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ওঁর 'সে যুগে মায়েরা বড়ো' নামের বইটিতে সুন্দর করে এঁকেছেন এ ছবি। তিনি দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন দেশের সামাজিক অবস্থায় এই সেদিন পর্যন্ত মায়েদের স্থান ছিল ওপরে। অনেক জাতির মধ্যেই একটু-একটু করে মাতৃপ্রাধান্যের ছবি ম্লান হয়েছে। যেমন চিনদেশের দক্ষিণ অঞ্চল। সেখানে বেশ কয়েকটি এমন জাতির মানুষ বাস করত যাদের মধ্যে শাসনের ক্ষমতা পুরুষের হাতে নয়, মহিলাদের হাতেই ছিল। এমনই এক জাতির নাম সু-মু। প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষেরও বেশি মানুষের জীবনচর্যায় শাসনের চূড়ান্ত ক্ষমতা তাদের রানির হাতেই। আরেকটি জাতি লুয়ে কুন, তাদেরও একই ব্যবস্থা। রানির বংশের মেয়েরাই রানি হতে পারে। এই জাতিদের মধ্যে একেবারে আধুনিক এই সময় পর্যন্ত চলে এসেছে মাতৃপ্রাধান্যের ধারা। গ্রানেট নামে এক পণ্ডিতের মতে, প্রাচীন যুগে নাকি চিনদেশে সম্পূর্ণ ভাবেই মাতৃপ্রাধান্যের ধারা ছিল। মায়ের বংশ

অনুসারেই ঠিক হত সন্তানদের বংশ-পরিচয়। একাধারে ঘর-সংসার, দেশ-শাসন, সবই মেয়েদের হাতে ছিল। চিন থেকে তিব্বতের দিকে এগোলে, তিব্বতের উত্তর অঞ্চলের নাম ছিল নুকুয়ো, যার অর্থ হল মেয়েদের সাম্রাজ্য। নুই-সু আর তাং-সু নামের প্রাচীন দুই চিনা পরিব্রাজক সেই অঞ্চলের বর্ণনা দিয়েছিলেন এ ভাবে—

'এই নুকুয়ো বা মেয়েদের রাজ্যটি কত বড়? তার পূর্ব থেকে পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত ন-দিনের পথ, উত্তর থেকে দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত বিশ দিনের পথ। এ রাজ্যে ৮০টি নগর, ৪০,০০০ পরিবারের বাস, ১,০০০ সৈন্য। এ দেশের চূড়ান্ত আধিপত্য একটি মেয়ের। রানির শাসন। এই রানির স্বামী কিন্তু রাজা নয়। দেশশাসনের ব্যাপারে তার কোন হাত নেই। এ দেশে প্রভূত পরিমাণে তামা, সিঁদুর, মৃগনাভি, লবণ আর তিব্বতি গরু হয়। তাই নিয়ে ওরা ভারতবর্ষে সওদাগরি করতে যায়। সওদাগরিতে প্রচুর লাভ। ওদের মধ্যে মায়ের বংশ অনুসারেই সন্তানদের বংশ-পরিচয়। পুরুষ চাকরেরা ধনী মেয়েদের সেবায় নিযুক্ত থাকে। এই পুরুষ চাকরেরাই রানিদের চুল আঁচড়ে দেয়, মুখে রং মাখিয়ে দেয়। রানির কয়েকশো অনুচর থাকে। প্রতি পাঁচদিনে একবার করে রানির দরবার বসে। সে দরবারে পুরুষদের নানারকম বাইরের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু সে সব দায়িত্ব পালন করার সময় পুরুষেরা নেহাতই মেয়েদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।'

এর পর যদি যাওয়া যায় তিব্বত থেকে আফ্রিকার দিকে, সেখানে দেখা যায় অসন্না, লটুটকা, ইউবেমবা প্রভৃতি বিশেষ করে পিছিয়ে-পড়া মানুষদের মধ্যে রাজা বলে কেউ নেই। তাদের মধ্যে আজও রানির শাসন। আবার কোথাও-কোথাও রানির শাসন ভেঙে রাজার হাতে যাওয়ার আগে একটা মাঝামাঝি অবস্থার ছবি পাওয়া যায়। সেটা কেমন? তার পরিচয় মেলে আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলে। তাদের মধ্যে দেখা যায় রাজার হাতে শাসনক্ষমতা আসছে, কিন্তু তবু রানির শাসনের বেশ খানিকটা রেশ থেকে গিয়েছে। যেমন, বগন্ডাদের কথা। তাদের মধ্যে রাজাই সব। কিন্তু তবু অবাক হওয়ার কথা, এই রাজা দুটি মেয়ের ওপর নির্ভরশীল। একজন হল রানি, অন্যজন রাজার মা। দুজনকেই রানি বলা হয়। দুজনেরই নিজস্ব রাজদরবার আছে, নিজস্ব লোকলস্কর, কর্মচারীও আছে। রানিমার প্রতিদিনের কর্তব্যের মধ্যে একটি হল রাজাকে খেতে দেওয়া। ওদের ধারণায় এই রানিমার মৃত্যু রাজার পক্ষে সাংঘাতিক সর্বনাশের ব্যাপার। তাঁর ওপর নির্ভর করতে না পারলে রাজা বাঁচবেন কী করে? তাই রানিমা যদি হঠাৎ মারা যান, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরই বংশ থেকে অন্য কোন মেয়েকে রানিমার পদে অভিষেক করে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। দেখা যাচ্ছে রাজার হাতে, পুরুষের হাতে ক্ষমতা থাকলেও মাতৃপ্রাধান্যের প্রভাব একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। তাই এই অবস্থাকে মাতৃপ্রধান ব্যবস্থা থেকে পিতৃপ্রাধান্যের দিকে যাওয়ার এক মাঝামাঝি অবস্থান বলা যায়। মাতৃপ্রাধান্য ভাঙছে, তবু তার প্রভাব

থেকে যাচ্ছে আরেক ভাবে। সেটা হল রাজদরবারে রাজার পাশেই রানির আসন। কিন্তু খোদ রানি আবার রাজার বোনেদের মধ্যে থেকেই কাউকে বেছে রাজার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তার হাতে দায়িত্ব অর্পণ করবে। এক আশ্চর্য নিয়ম!

প্রাচীন মিশরে এই ধরনের এক নিয়ম ছিল, তাদের দেশে প্রাচীন কালে রাজা-রানির সম্পর্ক ছিল ভাই-বোনের সম্পর্ক। শুধু রানির ছেলেমেয়েরাই ছিল রাজ-বংশের মানুষ। রাজার ছেলে যাতে রাজত্ব পায়, এই ব্যবস্থা করার জন্যে রাজার প্রয়োজন ছিল রাজবংশেরই কাউকে অর্থাৎ রানিমার মেয়েকেই বিয়ে করা কিংবা রানিমার কোন বোনের মেয়েকে বিয়ে করা। প্রাচীন মিশরের রাজবংশে তাই ভাইয়ের সঙ্গে বোনের বিয়ে দেখতে পাওয়া যায়।

এই ব্যবস্থায় মাতৃপ্রধান সমাজেরই ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। মাতৃ-প্রধান সমাজ হলে রাজবংশের উত্তরাধিকারী হত রাজবংশের মেয়েরাই। প্রাচীন মিশরে দেখা যাচ্ছে রাজবংশের ছেলে হিসেবে নয়, রাজবংশের মেয়ের স্বামী হিসেবে ছেলে রাজত্ব পাচ্ছে। অর্থাৎ মাতৃপ্রাধান্যের চিহ্ন রয়েছে। মেয়েদের সূত্রে রাজত্বের উত্তরাধিকার হচ্ছে। আবার মাতৃপ্রধান সমাজে ভাঙনের পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে রাজবংশের মেয়ে সরাসরি রাজত্বের অধিকার পাচ্ছে। রানির মেয়ে রানি, এই ব্যবস্থা ভেঙেছে। আবার রানির ছেলেমেয়ের হাতেই রাজত্ব থাকবে, তাই দুজনের মধ্যেই বিয়ে দেওয়ার আশ্চর্য রীতি ছিল তখন। এটা অবশ্য প্রাচীন নিয়ম।

প্রাচীন সুমেরিয়া নগরগুলিতে শাসক বলতে দু-রকম লোক ছিল। পুরোহিত আর রাজা। ওদের ভাষায় পটেসি আর লুগাল। সুমের ইতিহাসের একেবারে প্রথম যুগে লগ্‌স নামে নগরে একজন বিখ্যাত পুরোহিত শাসকের নাম হল লুগানভা। কিন্তু তার থেকে তার স্ত্রী বরনমটরার নামও কম খ্যাত ছিল না। কারণ স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে মিলে যৌথ ভাবে নগর শাসন করত। স্বামীর যেমন নিজস্ব দরবার ছিল, স্ত্রীরও তেমন নিজের আলাদা দরবার ছিল, তার নাম ছিল নারীসভা।

উরুকান্নিয় নামের আরেক পুরোহিত-শাসক ছিলেন, যাঁর স্ত্রীর নাম মগ্‌মগ্। তাঁর প্রভাব, প্রতিপত্তি ও শাসনক্ষমতা খুবই বেশি ছিল। তাঁর উপাধি ছিল দেবী বাউ। উরুকান্নিয়র প্রধানমন্ত্রীকে দেবী বাউয়ের কেরানি বলা হত। সেই অবস্থার দিকে তাকালে বুঝতে সুবিধে হয় যে তখনও শাসনক্ষমতা পুরোপুরি পুরুষ পুরোহিতদের হাতে এসে পড়েনি, আসল ক্ষমতা মেয়েদের হাতে ছিল। মরখাসি নামে সুমেরিয়ার আরেকটি নগর ছিল যেখানে পুরোহিত শাসক ছিলেন এক মহিলাই। প্রাচীন গ্রিসেও যে মাতৃপ্রধান সমাজ ছিল, সে কথা অধ্যাপক জর্জ টমসন নামের এক আধুনিক পণ্ডিত প্রমাণ করেছিলেন।

প্রাচীন পৃথিবীর অসংখ্য প্রান্তে মাতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থা ছিল। খাসি সমাজে মাতৃপ্রাধান্যের ধারাকে খুঁটিয়ে দেখতে গেলে চোখে পড়ে এ সমাজে পারিবারিক

জীবনে মায়ের কর্তৃত্ব থাকলেও গ্রামের প্রধান ব্যক্তিটি কিন্তু পুরুষ। এ ছাড়া মা উপার্জন করে সন্তানদের বড় করেন, তাঁর পদবিতেই ছেলেমেয়ে বড় হয়, কিন্তু স্থানীয় রাজনীতি 'দোলে'র নির্বাচনে মায়ের কোন ভূমিকা নেই। এ ঘটনা আধুনিক মাতৃপ্রধান আরেক সমাজেও দেখা যায়, কেরলের নায়ার সমাজ। সেখানেও মাতৃ-প্রধান সমাজ। নায়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে কিন্তু কৃষক খুঁজে পাওয়া যায় না। ভূস্বামী শ্রেণির মানুষ পাওয়া যায়। এখন দেখা যাচ্ছে নায়ার মহিলারা ঘর সামলাচ্ছে আর নায়ার পুরুষরা বেশি-বেশি করে মিলিটারি সার্ভিসে যাচ্ছে। নায়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পত্তি, যাকে 'তারাবৎ' বলা হয়, তার মালিক মহিলা। সেই সম্পত্তি মায়ের কাছ থেকে মেয়ের কাছেই যাচ্ছে। কিন্তু সেই সম্পত্তি দেখাশোনা করেন যিনি, কর্নবার, সে কিন্তু পুরুষ ম্যানেজার। কর্নবার সবসময় পুরুষই হয়। খাসি সমাজের সাম্প্রতিক ছবিও তাই। এই সমাজে মামার প্রাধান্য সাংঘাতিক। একই নিয়ম দেখা যায় লক্ষদ্বীপের ছোট কয়েকটি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে, কেরল বা কর্ণাটকেও যে-ধারা রয়েছে। খাসি সমাজে খানিকটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন তৈরি হয়েছে, খাসি মহিলা আর পুরুষের চিন্তায় পার্থক্য দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে। পড়াশোনা জানা ছেলেমেয়েরা মাতৃপ্রাধান্যের সমাজকে একধরনের বিচ্ছিন্ন সমাজ মনে করছে। অনেক ধরনের জটিলতার মধ্যে তারা ঢুকে পড়ছে। সামাজিক আর ধার্মিক নিয়মনীতির শিথিলতার দিকে ঘুরে-ঘুরে তাকাতেই হবে। বিষয়-সম্পত্তি হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা সামাজিক অবস্থান। এই মুহূর্তে খাসি মহিলাদের ওপর এক ধরনের সামাজিক আক্রমণ বা Social Violence দেখা যাচ্ছে, যা ভাবায়। কেন এই আক্রমণ? এটা কি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা, নাকি মাতৃপ্রাধান্যের অন্তিম মুহূর্ত সমাগত?

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট পাহাড়ি দেশ মেঘালয়— মেঘেদের বাড়ি। তিনটে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই দেশ— খাসি, গারো আর জয়ন্তিয়া। মূল অধিবাসীরাও খাসি, গারো আর জয়ন্তিয়া জনজাতির। মেঘালয়ের সমস্ত জনজাতির সমাজই মাতৃপ্রধান, মায়ের বংশ-পরিচয়েই সেখানে সন্তানের পরিচয়। পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোর বিপরীতে এই যে মাতৃ-প্রাধান্যের সমাজ— কেমন সেই সমাজ? এ কথা জানার আগ্রহে এ বইয়ে আপাতত খাসি জনজাতিকে বেছে নিয়েছেন লেখিকা। গত কয়েক বছর ধরে এ জন্য তিনি খাসি লোককথা, কবিতা, গল্প, মেঘালয় থেকে প্রকাশিত খাসি খবরের কাগজ, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি পড়েছেন; বারংবার মেঘালয়ে গেছেন, প্রত্যন্ত সব অঞ্চলে পাড়ি দিয়েছেন; সেখানকার মিউজিয়ম, বাজার, বইয়ের দোকানে গেছেন; খাসি সমাজের মানুষ, বিশেষত মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি করেছেন। এ বই তার ফসল। অতীত থেকে বর্তমান, খাসি জনজাতির এক সার্বিক পরিচয় ধরা থাকল এ বইয়ে।